তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ করল না

সংসদে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন চলছে। তাই বাজেটে প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, এর খাত ও অর্থসংস্থান, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। এ স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবকাশও কম। এখানে তত্ত্বকথা ও পরিসংখ্যানের তুলনায় দুচোখ মেলে বাস্তবতা দেখাকেই প্রাধান্য দিতে চাই। তবে আলোচনায় একটু ভিন্নমুখীতা তো থাকবেই। আমি বাজেটের প্রকৃতি, নীতি ও সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো, যার সাথে এ বাজেটের সম্পৃক্ততা কম। পত্রপত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে যেসব আলোচনা আসছে, অধিকাংশই স্বল্প-ময়াদী, আগামী এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাজেট কিন্তু আর্থিক পরিকল্পনা। ভিত্তিহীন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদীও হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার বাৎসরিক রূপের নামই বাজেট। তাই দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদের নীতি ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে বাজেট হয় না। আবার সম্ভাব্য আর্থিক পরিকল্পনার আওতা যত বিশালই হোক না কেন, বাজেট বিষয়টাই নিরস ও কাটখোট্টা কিসিমের। তৈরিতে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো লাগে। তাই পত্রিকার জন্য কোনো নিবন্ধ রচনায় রসের প্রলেপ না থাকলে সে নিবন্ধ সাহিত্য আসরে কল্কে পায় না, কারণ নিবন্ধও তো সাহিত্যের একটা রূপ। সেজন্য নিবন্ধ রচনায়ও রসবোধ থাকা চায়।

প্রথমেই একটা গল্প বলে নেয়া যাক। গল্পটা এরকম: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের গ্রাম থেকে পনেরো কি:মি: ভাটিতে চারপাশে জলাভূমিতে ঘেরা এক গ্রামের একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর ঐ বাড়িতে একজন অল্প-শিক্ষিত মৌলবি কোনো এক কাজে এলেন। বৈঠকখানায় বসে বড়দের সাথে কথাপ্রসংগে বললেন, 'তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ করলো না।' আমি বরাবরই একজন গুণমুগ্ধ শ্রোতা; তখন সবে কৈশোর পেরিয়েছি। কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, 'কথার অর্থ আমাকে একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।' তিনি বললেন, 'কড়াইয়ে ডাল তেলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন মাফিক তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। নিয়মমতো তেলের উপর ফোড়নও দেওয়া হয়েছে। কড়াইয়ে তেল গরম না হতেই ডাল ঢেলে দেওয়া হলো। ডালটা নীরবে তেলের সাথে মিশে গেল। একটুও 'ফ্যাচ' শব্দ করলো না। বলা যায়, তেলটা নষ্ট হলো।' এতটা বছর পর জীবনের পড়ন্ত বিকেলে এসে সে কথাটা বাংলা ভাষায় বাগ্‌ধারা হিসেবে জীবনের পদে পদে ব্যবহার করতে পেরে ভালো লাগছে। আরো ভালো লাগছে সেই সত্তরের দশকে 'আয়কর' বিষয়ে ক্লাশে পড়া অনেক প্রশ্নের মধ্যে দু-একটা জিইয়ে রাখা প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতে পারছি ভেবে। আমি জানি, এ ভাবনার মতো আরো শতেক ভাবনা এখন বলতে না পারলে হয়তো অচিরেই আমার সহগামী হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। সে জন্যই নিবন্ধে 'জীবন-থেকে-নেয়া' ঘটনার অবতারণা করি।

বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর কমপক্ষে একমাস ধরে চলে কোন কোন আইটেমের উপর কর ধার্য হলো, কোন আইটেম করের বাইরে থাকলো। এর প্রভাব বাজারে কেমন পড়বে ইত্যাদি নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি। বাজেট-পূর্ব ও বাজেট-পরবর্তী আলোচনা যা হয়, এর মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ হয়। বাজেট মূলত ব্যয়ভিত্তিক পরিকল্পনা। সারা বছরের সরকারি সম্পদ ও সেবা অর্জনের ব্যয়। ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে আয় নির্ধারণ করা হয়। পরিমিত আয়ের খাতে টান পড়লে ব্যয় করবেন কোথা থেকে! পর্যাপ্ত আয় করতে পারলে হাত ভরে প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা যায়। আমরা করের সমতার নীতিমালা মেনে কি ঠিকঠাকমতো আয় করতে পারি? বাজেটের আয় ও ব্যয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। গলদটা তো এখানেই। সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন থেকে যে সেবা আমরা অর্জন করি তা পেতে সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এ বছর এ ব্যয়ের পরিমাণ যথাসম্ভব ৬২ শতাংশ। একে সরকারি পর্যায়ে সেবা উৎপাদনের ব্যয়ও বলা যায়। এর মধ্যে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ প্রদেয় সুদ বাবদ ব্যয় রয়ে গেছে। আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবা পেতে কোষাগার থেকে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি– বিষয়টা নিয়ে আমরা আদৌ ভাবনা-চিন্তা করি কী-না? অর্জিত সেবার তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে গেলে বাজেট যে একটা

পরিকল্পনা, তা সুষ্ঠু হয় কী করে? এসব তো কোনোদিন আলোচনায় আসতেই দেখিনে। তাহলে ব্যয়ের যথার্থতা বুঝবো কীভাবে? অনেক ক্ষেত্রেই বাজেট থেকে অনেক টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রজেক্টও পরিচালনা করি। প্রজেক্ট শেষে বা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শেষ হবার পর এর মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়। আমরা চর্মচোখে আনাড়ির মতো অনেক প্রজেক্টের বাস্তব সুফল সম্বন্ধে যে ধারণা পাই, তাতে প্রজেক্ট শব্দটা নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। এ তিক্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলেই অর্জিত সেবা ও পরিকল্পিত ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। নইলে সেই মৌলবি সাহেবের কথা 'তেলের নামে তেল গেল, ...' মনে পড়ে যায়। এদেশে তো 'সরকারমে মাল, দরিয়ামে ঢাল' কথাটা সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। আর কতকাল শুনতে হবে? এর জন্য কি কাউকে জবাবদিহি করা যায়? স্বল্পমেয়াদী এ বাজেট পরিকল্পনায় পরিচালনা খাতে যত ব্যয়, এদেশ তত বাঞ্ছিত সেবা প্রকৃত অর্থে অর্জন করতে পারছে কী-না? এ পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ঋণের সুদের কিস্তি যোগ থাকলে সুদকে অর্থসংস্থানের ব্যয় বলা যায়। অর্থসংস্থান করে কী করেছি, জানা দরকার। ঋণ করে কোনো সম্পদ অর্জনে টাকা বিনিয়োগ করেছি কী-না? সে সম্পদের নীট বর্তমান মূল্য কত? ঋণ করে ঘি খেয়েছি কী-না? আমাদের সমাজে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ঋণ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস কেউ কেউ গড়ে তোলেন। এ অভ্যাস ভালো ফল বয়ে আনে না। আমি আমাদের গ্রামের কারও কারও এ অভ্যাসের কারণে ভিটে-বাড়িও বিক্রি হয়ে যেতে দেখেছি। বাজেট একটা আর্থিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। আমাদের সে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কোথায়? আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, তারা ঘি খাওয়ার জন্য ঋণ করে না।

ভারত নিয়ে আরেকটা উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভারত এবং বাংলাদেশ রাশিয়া ব্লকে থেকে রাশিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে। আমরা একটা নির্দিষ্ট মূলধনের অধিক মূলধনবিশিষ্ট কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করে তার হাজার হাজার কোটি টাকার লোকসানের জের বাজেট বরাদ্দের নামে দীর্ঘ বছর ধরে টেনেছি, এখনো অনেক টানছি। দেখার বিষয় হলো, ভারত কিন্তু রাশিয়ার মতো করে আমাদের জাতীয়করণ নীতি তখন অনুসরণ করেনি। দীর্ঘ বছরের বাজেটে লোকসানের এ জের টানার উল্লেখযোগ্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এখানেও মৌলবিসাহেবের সেই কথা, 'তেলের নামে তেল গেল, ...।' নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথাকে বিবেচনায় এনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা মিল-কলকারখানা জাতীয়করণ করেছিলাম। আমি বাম-ঘরানার কমরেডদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, এর ফলে টার্গেট শ্রেণি কোনোভাবেই এ পর্যন্ত উপকৃত হয়নি। উপকৃত হয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা, 'বুর্জোয়া সরকারি কর্মকর্তারা' ও সমসাময়িক 'রাজনৈতিক বুর্জোয়া নেতারা'। তার বড় রকমের প্রভাব পড়ে আসেছে আমাদের বাজেটে। লোকসানের ভারটা সবসময় সাধারণ মানুষের কাঁধে এসে পড়ে। তাই এগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। বাণিজ্যে ডলার পরিশোধে বড় রকমের সংকট এবং টাকার অবমূল্যায়ন মূল্যস্তরে ও উৎপাদনের অনেক উপাদানে প্রভাব ফেলেছে, পরিস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছে, এ থেকে কাটিয়ে ওঠা অতটা সহজ নয়। যা তুলনামূলক বিবেচনায় দেখলে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েনি। কেন এমন হলো, ভেবে দেখেছি কি? আমরা নগদটা বুঝি, সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করি; দেশের অর্থব্যবস্থার 'ডিগ্রী অব অপারেটিং লিভারেজ', 'ডিগ্রী অব ফিন্যান্সিয়াল লিভারেজ' এবং রাষ্ট্রীয় কাজে অর্জিত সেবার তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের সমতা বুঝতে চাই না– এখানেই সমস্যা। আমরা ক্ষত নিবারণ করতে অবিরাম মলম মলিশ করি, তাতে ক্ষতের সাময়িক উপশম হয়; পারতপক্ষে এ্যান্টিবায়টিক ব্যবহার করে ক্ষত নিরাময় করিনে। রাজস্ব বিভাগের জন্য যত টাকা পরিচালন ব্যয় হিসেবে খরচ করছি, তত সেবা সেখান থেকে পাচ্ছিনে। পেলে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে যেত। প্রত্যক্ষ করের খাত পরোক্ষ করের খাতেকে ছাড়িয়ে এক নম্বরে এসে যেত। তাতে উন্নতির নামে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অনেক কমতো। আসল ও সুদসহ ঋণের কিস্তি পরিশোধ অনেক কমে যেত। দেশের অর্থনীতিতে রক্তশূণ্যতা কমতো। আমরা 'অগত্যা মধুসূদন' হিসেবে সহজ বুদ্ধিতে প্রতিবাদহীন পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বসিয়ে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছি।

আবার ভ্যাট আদায়েও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য পরোক্ষ কর আদায়েও শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। এদেশে বসবাসরত দুচোখওয়ালা প্রতিটা ব্যক্তিই তা জানেন। ফলে সরকারি কোষাগারে টাকা কমে যায়। পদে পদে কর আরোপের নীতির বরখেলাপ ও অমান্য করি। এই দুর্মূল্যের বাজারে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' বসায়। ৩৮ ধরনের সেবা না পাওয়ার বিধান তৈরি করে বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে রিটার্ন জমার স্লিপ পেতে দুই হাজার টাকা করের ব্যবস্থা করে সহজ পথে প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়াতে চাই। অল্প আয়ের লোকেরা কর দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। আয় বৈষম্য বাড়ছে। অবৈধভাবে দেদার টাকা কামানো যোগ্য (?) ব্যক্তিরা কর ফাঁকি দিয়ে যোগ্যতা ও ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে। সমাজে তাদের পোয়াবারো। রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাথে তাদের সখ্য বেশি। বলতে হয়, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না-কো তুমি, সকল দেশের...।' আবার লক্ষ লক্ষ একমালিকানা কারবারি বাৎসরিক ন্যূনতম পঞ্চাশ লাখ টাকা লাভ করে কর অফিসে তিন হাজার বা সামান্য একটু বেশি টাকা সরকারের নামে জমা দিয়ে পার পেয়ে যায়। এমনটি কেন হয়? কোম্পানিগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। কোম্পানির পরিচালকরা ও একমালিকানা কারবারিরা নতুন মডেলের গাড়ি হাকিয়ে আধুনিক ভোগ-বিলাসে দিন পার করেন, কিন্তু কর অফিসকে কীভাবে ম্যানেজ করেন, খোদা মালুম। যৎসামান্য কর আদায় নিয়েই কর অফিস মিটিংয়ে-মজলিসে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এসব নিয়ে জনমনে শতেক প্রশ্ন। এ প্রশ্ন কিন্তু এদেশের আরও অনেক সরকারি বিভাগ ও সরকারি কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য। এসব বিবেচনা করলে দেশে আইনের শাসনের নিম্নাবস্থা বোঝা যায়। ইদানীং কর আদায়ের জন্য 'কর এজেন্ট' নামে আরেক মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব কর-আদায় কাঠামোতে আনছি। এতে কর আদায়ে পজিটিভ কোনো প্রভাব বাজারে পড়বে বলে মনে হয় না। বরং হিতে বিপরীত হবে। কর আদায় দালালি ব্যবসায়ে পরিণত হবে। করের নামে চাঁদা আদায় বৃদ্ধি পাবে। সমাজে কোনো নিয়ম চালু করার আগে সমাজকে ভালোভাবে পড়তে ও বুঝতে হয়। নইলে তাতে ফলোদয় কিছু হয় না, জটিলতা বাড়ে ও রাজনৈতিক ধান্দাবাজিতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসা ও কোম্পানির আয় নির্ধারণে এবং আয়কর আদায়ের ক্ষেত্রে দেশে সরকার কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত কোনো নতুন টেকনোলজির ব্যবহার করা যেত। আরো অনেক প্রতিষেধক ব্যবস্থা আছে, তবে আয়কর আদায়ে মধ্যস্বত্বভোগী দালালি ব্যবসার প্রবর্তন কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বলা যায় যে, রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং অর্জিত সেবা ও সম্পদের পরিমাণ সমান না হওয়ার সমস্যা এদেশে প্রকট। তাছাড়া ঋণ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে। আবার ঋণের টাকাই হোক আর কর আদায়ের টাকাই হোক, পাঁচ টাকা দামের ঘি বারো টাকা ব্যয় করে আমরা অর্জন করি। অতিরিক্ত সাত টাকা শালীন শব্দ– 'সিস্টেম লসে' খেয়ে যায়। অতিরিক্ত এ সাত টাকাও তো বাজেট-আয়ের মাধ্যমেই কোষাগারে আসে। অর্জিত সম্পদের বর্তমান মূল্য এদেশে বাজেটকৃত ব্যয়িত টাকার পরিমাণের সমান হয় না। কেন হয় না, এদেশে এর জবাব সবাই জানে, কিন্তু কেউ দেয় না। ঋণকৃত টাকা ও তার সুদের কিস্তি দিতে মোট বাজেটের হয়তো এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হয়ে যায়। বিষয়টা হতাশাজনক। আবার টাকার অভাবে তেল-গ্যাস-কয়লা আমদানি করা সম্ভব হয় না। জনদুর্ভোগ বাড়ে। এসবই গরিবের ঘোড়া রোগ। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এসব রোগের কোনো চিকিৎসা এদেশে নেই। বরং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র পালন করতে আমরা অনভ্যস্ত।

(১১ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।